দৈনিক বাংলা ৬।

তারিখ 16 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

পরীক্ষা ব্যবস্থা ঃ দুর্নীতি দমনে কঠোরতা প্রয়োগের সীমা

দেশে এখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার সময় এলে আমরা প্রতি বছরই একটা বিষয়ে বেশ ভাবিত হয়ে পড়ি। বিষয়টি হচ্ছে পরীক্ষায় দুর্নীতি বা শিক্ষার্থী সমাজের নৈতিক অধঃপতন। ভাবিত হওয়ার মত বিষয় সন্দেহ নেই। পরীক্ষাতো বলতে গেলে শিক্ষার মান নির্ধারক। শিক্ষাজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে গৃহীত এ পরীক্ষার তাৎপর্য আরো বেড়ে যায় এ জন্য যে, এ পরীক্ষার ফলাফলই পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে দুর্নীতি বা অসদুপায় যদি এতে প্রশ্রয় পায়, উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষাও ভুল পথে পরিচালিত কিংবা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হয়। আমরা তাই বরাবরই দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষার দাবী করে চলেছি। পরীক্ষা সামনে এলে, আর পরীক্ষাচলাকালে বিষয়টা নতুন করে মনোযোগ আকর্ষক হয়ে ওঠে। বলা কওয়াতে যে কিছুই ফায়দা হয় না, এমন না। দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। এ বছর তো পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই বেশ কিছু কঠোর ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে রয়েছে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিল করা থেকে শুরু করে তিন বছর পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ রহিত করার মত কঠোর ব্যবস্থা। ক্ষেত্রভেদে জেল–জরিমানার ব্যবস্থাও আছে। দুর্নীতিতে সহায়তার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্যেও কঠিন শাস্তির বিধান আগাম জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এত সব কঠোরতার কিছু ফায়দা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। ওয়াকিফহাল মহল মনে করেন, এবার উচ্চ মাধ্যমিক পারীক্ষা থেকে বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য হিসাবে নিলে দেখা যাবে, এবারও কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী দুর্নীতির দায়ে শাস্তি পেয়েছেন, বেশ কজন শিক্ষক সহায়তার দায়ে বহিস্কৃত হয়েছেন এবং এ বছরও দুর্নীতি অবলম্বনে বাধা দিয়ে কিছু শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন।

এ ধরনের একটি ঘটনাই পরিতাপের জন্যে পর্যাপ্ত। আমরা তবু সংখ্যা হ্রাসে তৃপ্তি প্রকাশ করতে চাই। চাই এ জন্যেই যে, দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতিতে উন্নতির সামান্য আভাসও আশা করার শক্তি জোগায়। আর বিষয়টা যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ, সেখানে আশার চেয়ে বড় কিছু থাকতে পারে না। যতক্ষণ আশা বেঁচে থাকবে, ততক্ষণই ভরসা। আমরা এক্ষেত্রে তাই আশাবাদী হতেই আগ্রহী।

কঠোরতাই যদি প্রতিকার আনে সে কঠোরতাকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। আর আমরা গোড়া থেকেই তা জানিয়ে আসছি। পরীক্ষায় দুর্নীতি বা অসদুপায় অবলম্বনকারীদের প্রতি কারো সহানুভূতি থাকতে পারে না। কেউ তেমন সহানুভূতি প্রকাশ করেছে বলেও আমাদে জানা নেই। এ সবই শুভ লক্ষণ বলে গণ্য হতে পারে। আমরা আবার দেখতে চাই, আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা সকল আবিলতামুক্ত হয়ে উঠেছে। মেধা আর অধিত বিদ্যার যাচাই শিক্ষার্থীদের যথার্থ মান নির্ধারণ করে উচ্চতর শিক্ষাকে নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে।

এ প্রত্যাশা আছে বলেই চলতি পরীক্ষার কিছু অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন মনে করি। দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে পরিদর্শকদের কঠোর হতে হবে সত্য, তবে সে কঠোরতাকেও অবশ্যই যুক্তি আর ন্যায়ের সীমা মানতে হবে। এটি সর্বত্র ঘটছে না বলেই ভিন্নতর বিপত্তির উদ্ভব ঘটছে। উদাহরণ দিলেই বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

সন্দেহজনক ক্ষেত্রে পরীক্ষার খাতা জব্দ করার এখতিয়ার পরীক্ষকদের আছে। কিন্তু এ এখতিয়ারের অযৌক্তিক প্রয়োগ পরীক্ষার্থীর জন্যে কত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে তা ভেবে দেখার মত। যেমন গত রোববার ছিল অঙ্ক প্রথম পত্রের পরীক্ষা। ঢাকার একটি কেন্দ্রে একজন পরিদর্শক লক্ষ্য করলেন পরীক্ষার্থীর সামনে রাখা জ্যামিতি বাক্সে কিছু মুদ্রিত কাগজও আছে। তিনি পরীক্ষার্থীর খাতা আটক করলেন। শুরু হল বাকবিতন্ডা আর কাকুতি–মিনতির পালা।

পরীক্ষার্থীর বক্তব্য, পরীক্ষার জন্যে যে নতুন জ্যামিতির বাক্স কিনে এনেছে। বাক্সে এ ধরনের কিছু কাগজ থাকেই। ব্যবহারের সুবিধার্থে এতে কিছু মাপঝোপ দেয়া থাকে। অঙ্ক পরীক্ষার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই।

পরিদর্শক এসব শুনতে নারাজ। এভাবে পনেরো–কুড়ি মিনিট কেটে যাওয়ার পর পরীক্ষার্থীর শেষ আবেদন জানালো সব কটি নয়া জ্যামিতি বাক্স পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। তার ধারণা, নব নতুন বাক্সেই এ কাগজ পাওয়া যেতে পারে।

পরীক্ষার্থীটির ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। এই শেষ আবেদনটি পরিদর্শককে কিছুটা নমনীয় করলো। তিনি আরো কয়েকটি বাক্সে উঁকি দিলেন। আর পরীক্ষার্থীর বক্তব্যই সত্য বুঝতে পেরে ওকে খাতা ফিরিয়ে দিলেন। সমস্যার একটা সমাধান হল। তবে পরীক্ষার্থীটির যেটুকু সময় নষ্ট হল, তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হল না। জানা থাকা সত্ত্বেও দুটি অঙ্কের সমাধান করা সম্ভব হয়নি তার সময়ের অভাবে। আর গোটা ঘটনায় অন্য পরীক্ষার্থীদেরও মনোযোগ বিঘ্নিত হল। কিছু সময়ও গেল।

একই পরীক্ষা কেন্দ্রে আরো মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষার দিন। আজকাল পরীক্ষা কেন্দ্রে ক্যালকুলেটর ব্যবহার বৈধ। একজন পরীক্ষার্থী নতুন ক্যালকুলেটর নিয়ে যায়। বাক্সে ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত কিছু কাগজও ছিল। পরিদর্শক ঐ কাগজকে নকল গণ্য করে খাতা জব্দ করেন। পুরো আধ ঘন্টা ঐ পরীক্ষার্থীর লেখা বন্ধ থাকে।

অন্যান্য পরীক্ষার্থীরাও এ উত্তেজক এবং নাজুক পরিস্থিতিতে আবেদন–নিবেদনে বেশ কিছু সময় নষ্ট করে। শেষে পদার্থ বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক এসে সব দেখে রায় দেন; ক্যালকুলেটরের এই ব্যবহারবিধির সঙ্গে পদার্থ বিদ্যার পরীক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। পরীক্ষার্থী রেহাই পায়।

রেহাই তো পেলো। কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়া আধ ঘন্টা সময়ের কি হবে? এতে কারো কিছু করার নেই। এর ফলে পরীক্ষার্থীর জীবন যদি মারাত্মকভাবে প্রভাবিতও হয়, তাতেও কারো কিছু করার নাই। ভাগ্য বলেই একে মেনে নিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে, ভাগ্য বলেই যদি মেনে নিতে হয়। তবে সুচিন্তিত সব ব্যবস্থাপনার অর্থ কি দাঁড়ায়?

এ ঘটনাগুলোকে বেশী বড় সমস্যা মনে করবেন না। আর বড় নয় বলেই কারো মনোযোগও তেমন আকর্ষণ–করবে না। অথচ এ ধরনের 'ছোট দুর্ভাগ্য' কি দুর্ভোগ টেনে আনে, তা–ও নজির দিয়ে পরিষ্কার করা যায়।

দু'বছর আগে ঢাকার একটি নামী বিদ্যালয়ে ভূগোল পরীক্ষার দিন পরিদর্শকেরা ঠিক করলেন, যা করার তারা আসনে বসে বসেই করবেন। চেয়ার ছেড়ে কেউ উঠবেন না।

সিদ্ধান্তটি ছিল তাদের একটা প্রতিবাদ। পরীক্ষার শুরু থেকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পরিদর্শকদের চা–নাস্তা দেয়া হচ্ছিল। ভূগোল পরীক্ষার দিনই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্থির করলেন, পরিদর্শনের জন্যে যেহেতু অর্থ দেয়া হয়, এ বাড়তি খরচ তিনি করবেন না।

প্রধান শিক্ষকের সিদ্ধান্তে যেমন যুক্তি আছে, তেমনি একটি চালু সবিধা থেকে বঞ্চিত শিক্ষকদের প্রতিবাদও এক কথায় অযৌক্তিক বলার উপায় নেই। কিন্তু এর পরিণামটি পরীক্ষার্থীদের অন্ততঃ একজনের জন্যে যে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করে জানি।

ব্যাপারটি ছিল এই, পরিদর্শকেরা আসনে অটল থাকার ফলে পরীক্ষার্থীদের বার বার উঠে গিয়ে অতিরিক্ত কাগজ আনতে হয়। ভূগোলের মত বিষয়ে বিস্তর লেখার প্রয়োজন। সব পরীক্ষার্থীদেরই তাই অতিরিক্ত কাগজের দরকার পড়ে। পরিদর্শকের টেবিলের সামনে তাই লাইন লেগে যায়। এক খন্ড কাগজ পেতে পাঁচ থেকে সাত মিনিট করে সময় দিতে হয়। একজন শিক্ষার্থীকে পাঁচখানা কাগজ এভাবে নিতে হয়েছিল, যাতে কম করেও তাকে আধ ঘন্টা সময় নষ্ট করতে হয়। আর এর ফলে কুড়ি নম্বরের উত্তর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই পরীক্ষার্থীকে দু'নম্বরের জন্যে স্টার পাওয়ার সম্মান হারাতে হয়েছিল। সকলকে স্টার পেতেই হবে, এমন বলছি না। তবে স্টার পাওয়া আর না পাওয়া, দুটি নম্বরের জন্যে হলেও, একজন শিক্ষার্থীর জীবনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, তাকে খাটো করে দেখার উপায়নেই।

এবারকার উচ্চ মাধ্যমিকের যে দুটি ঘটনা উল্লেখ করলাম, সে–ও এই রাজধানী নগরীরই এক নামী কেন্দ্র। এখানেই যদি এমনটা সম্ভব হয়, দূর–দূরান্তে কি ঘটতে পারে, সহজেই অনুমেয়। আর একে আমরা কি বলে সমর্থন করবো?

বলা হতে পারে, এ দু'টি ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক সম্ভবত পদার্থ বিদ্যা বা অঙ্কে অভিজ্ঞ ছিলেন না এমনটা হওয়া বিচিত্র কিছু না। ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকেরাও পরিদর্শক থাকেন। থাকতেই হবে। তবে এর দ্বারাও কিন্তু পরীক্ষার্থীদের সময় নষ্ট করা কিংবা পরীক্ষার ফলাফল প্রভাবিত হওয়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভবকে সমর্থন করা যায় না। অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষার ফল উন্নত করা যদি অপরাধ হয়, অন্যের ভুলে কারো ফলাফল খারাপ হওয়াও অন্যায়। তাই এর বিরুদ্ধেও সতর্কতা আরও প্রয়োজন হলে কঠোরতা আবশ্যক।

ছোট বলে এ ধরনের সমস্যাকে উপেক্ষা করা অনুচিত। এখানে রবীন্দ্রনাথ খুবই প্রাসঙ্গিক,—'বড় কাজ নিজে বহে আপনার ভার/বড় দুঃখ নিয়ে আসে সান্ত্বনা তাহার/ছোক কাজ, ছোট ক্ষতি ছোট দুঃখ যাত/বোঝা হয়ে চাপে, প্রাণ করে কণ্ঠাগত।' ছোট হলেও প্রাণ কণ্ঠাগত করা এসব সমস্যার প্রতি নজর দেয়া দরকার।

এ ক্ষেত্রে একটি কথাই বলার আছে। কঠোরতার সঙ্গে সততা আর আন্তরিকতার যোগ না থাকলে তা প্রায়ই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই যে কথায় বলে দন্ডিতের সঙ্গে দন্ডদাতারও কাঁদার প্রয়োজন আছে। এ কথাটি মনে রাখতে হবে। পরীক্ষায় দুর্নীতি দমনের কঠোরতা অবলম্বনের লক্ষ্য একটাই— পরীক্ষার্থীরেই কল্যাণ নিশ্চিত করা। এক কঠোরতার প্রয়োগকারীরা যাতে এ মূল লক্ষ্য বিসৃত না হন, তেমন কিছু ব্যবস্থা আবশ্যিক।

সালেহ চৌধুরী